রাজনীতিতে এসব কী ভাষা!

সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে এক উদ্বেগজনক এবং নজিরবিহীন প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। রাজনীতিতে আদর্শ, যুক্তি আর জনকল্যাণের বিতর্কের জায়গাটি ক্রমেই দখল করে নিচ্ছে কুরুচিপূর্ণ আক্রমণ, ব্যক্তিগত কাদা-ছোড়াছুড়ি এবং চরম অশ্লীল ভাষা।

সম্প্রতি গত ৩০ মে শনিবার মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকী পালন উপলক্ষে এক সমাবেশে অশালীন ও কুরুচিকর বক্তব্য দেন বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান বাবলু।

সেখানে যে ধরনের অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন তা সচেতন সমাজকে স্তব্ধ ও লজ্জিত করেছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাগাড়ম্বর বা তীব্র রাজনৈতিক বিরোধিতা নতুন কিছু নয়। কিন্তু বিরোধিতার নামে প্রকাশ্য জনসভায় অশ্লীল শব্দচয়ন, প্রতিপক্ষকে নোংরা ভাষায় আক্রমণ কিংবা নারীর প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য কোনো সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হতে পারে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই ধরনের আচরণ এখন আর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এক শ্রেণির নেতার নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

অবক্ষয়ের শেষ সীমা কোথায়?

একজন রাজনৈতিক নেতা যখন মঞ্চে দাঁড়ান, তখন তিনি কেবল নিজের দলের প্রতিনিধিত্ব করেন না, বরং তরুণ সমাজ এবং সাধারণ মানুষের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দেন। জনসভার সামনে দাঁড়িয়ে যখন প্রকাশ্য মাইকে অশালীন শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তখন তা শুধু রাজনৈতিক পরিবেশকেই বিষাক্ত করে না, বরং গোটা সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে ধসিয়ে দেয়। প্রশ্ন উঠছে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মীদের এবং নেতাদের ন্যূনতম আচরণবিধি শেখাতে কেন ব্যর্থ হচ্ছে? ক্ষমতার দাপট বা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অন্ধ মোহ কি আমাদের ন্যূনতম সৌজন্যবোধকেও গ্রাস করে নিয়েছে?

বিষাক্ত হচ্ছে তরুণ সমাজ

রাজনীতির মাঠ থেকে আসা এই নোংরা ভাষা গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষের

মুঠোফোনে। এর সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে কিশোর ও তরুণ প্রজন্ম। তারা যখন দেখে সমাজের তথাকথিত ‘নেতারা’ কোনো জবাবদিহিতা ছাড়াই অনায়াসে এসব ভাষা ব্যবহার করছেন, তখন তারা একেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিচ্ছে। এটি আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক শিক্ষার পরিপন্থী।

রাজনৈতিক দলগুলোর নীরবতা ও দায়

সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয় হলো, দলের শীর্ষস্থানীয় কোনো নেতার মুখ থেকে এমন কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য আসার পর দলের পক্ষ থেকে সাধারণত কোনো কঠোর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না। উল্টো অনেক সময় একে ‘স্লিপ অফ টাং’ বা ‘কথার কথা’ বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক নীরবতা বা পরোক্ষ প্রশ্রয়ই অন্য নেতাদের আরও বেপরোয়া করে তুলছে।

রাজনীতি হোক যুক্তির, মতাদর্শের এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার। কাদা- ছোড়াছুড়ি আর অশ্লীলতা দিয়ে সাময়িক করতালি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা পুরো জাতিকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে মনে রাখতে হবে, ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা তাদেরও দায়িত্ব। এই নোংরা সংস্কৃতির অবসান এখনই প্রয়োজন।

আরবি ভাষার উৎস, জন্ম ও ক্রমবিকাশ- এম এ এস ইমন

তাদের বাণিজ্যপথের মাধ্যমে নাবাতিয়ান আরবি ভাষা ও এই রূপান্তরিত আরামাইক লিপি আরব উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে হিজাজ (বর্তমানে ইসলামের পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা এই হিজাজ অঞ্চলে অবস্থিত) হয়ে ইয়েমেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

যা-ই হোক, প্রথমে নাবাতিয়ান বাণিজ্যের প্রভাবে এবং পরে ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে সারা আরব উপদ্বীপেই ধীরে ধীরে আরবি ভাষা ছড়িয়ে পড়ে, এবং আগের প্রাচীন ভাষাগুলোর ব্যবহার কমতে কমতে এককালে হারিয়ে যায়। প্রধান ব্যতিক্রম থেকে যায় নাবাতিয়ান রাজ্য থেকে দূরতম প্রান্তে অবস্থিত ইয়েমেন ও ওমান সীমান্তে হাজরামাউত ও

জুফার অঞ্চল, যেখানকার আঞ্চলিক ভাষা তখনও আরবি ছিল না।

৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কের ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে আন-নামারাতে আরেকটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। এই শিলালিপির ভাষাটি প্রায় শাস্ত্রীয় আরবির মতোই। যদিও এই শিলালিপিগুলো স্পষ্টতই আরবি ভাষায় লেখা, এগুলো আরবি লিপিতে লেখা নয়, বরং এটি নাবাতিয়ান লিপি, যা আরামাইক লিপি থেকে এসেছে।

কিন্তু কিছু শিলালিপি খ্রিষ্টীয় ৪র্থ এবং ৫ম শতাব্দীরও রয়েছে, যেগুলো আরবি ভাষার মতো একটি লিপিতে লেখা। সাধারণত মনে করা হয় যে, আরবি লিপি নাবাতিয়ান লিপি থেকে বিকশিত হয়েছে, এবং এই শিলালিপিগুলো একটি স্ক্রিপ্ট বা লিপিতে লেখা হতে পারে যেটি এই দুটির মধ্যে হতে পারে। এই শিলালিপিগুলো মূলত উত্তর আরবের ছিল।

অন্যদিকে, দক্ষিণ আরবীয়রা তাদের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়কে লিপিবদ্ধ করার জন্য যে ধরনের উপাদান ব্যবহার করত, তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ধরনের শিলালিপির প্রাচীনতম নিদর্শনগুলোর বয়স খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম ও নবম শতক।

এই লিপিগুলো লেখা হতো একবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, পরের লাইন ডান থেকে বাঁ দিকে। এই লিপিগুলো থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ আরবীয় বা মিনীয়-সাবিয়ান ভাষার (হিময়ারাইট নামেও পরিচিত) বর্ণমালাতে ২৯টি অক্ষর ছিল যা আধুনিক আরবি বর্ণমালাতেও দেখা যায়। বর্ণগুলোর আকার ছিল অনেকটা কাঁটাওয়ালা আঁকশি বা কুড়ুলের মতো।

এগুলো এসেছিল সিনিয় বর্ণমালা থেকে, যেটি আবার ফিনিশিয় ও মিশরীয় বর্ণমালার পূর্বসূরির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তুলেছিল। এই সমস্ত সুসামঞ্জস্য অক্ষরগুলো একটি দীর্ঘ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

অন্যান্য সেমিটিয় বর্ণমালার মতো এর বর্ণমালাতেও কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণেরই অস্তিত্ব ছিল। বিশেষ্য পদ গঠনে, ক্রিয়ার ধাতুরূপ, ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ও শব্দভাণ্ডারের বেশ কিছু ক্ষেত্রে আক্কাদিয়ান (অ্যাসিরো-ব্যাবিলনিয়ান) ও ইথিওপীয় ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার মিল লক্ষ্য করা যায়।

আবার, এই ভাষার মধ্যে ভাঙা-ভাঙা বহুবচন লক্ষ্য করা যায় যা উত্তর আরবীয় ও ইথিওপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করে। আক্কাদিয়ান,

দক্ষিণ আরবীয় ও ইথিওপীয় ভাষা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনো সেমিটিক ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করেছে। ইয়েমেন সংস্কৃতি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার বিলুপ্তি ঘটে, আর এই স্থান দখল করে নেয় উত্তর আরবীয় ভাষা। উত্তর আরবে ‘উকাজ’-এর মতো সাহিত্য মেলা, কাবায় বার্ষিক হজ্বযাত্রা ও মক্কার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

আরবে ইসলাম আগমনের আগে, উপদ্বীপের চারপাশে আরবি ভাষার অসংখ্য উপভাষা প্রচলিত ছিল। তবে ‘কোইন’ নামে একটি সাধারণ সাহিত্যিক ভাষাও ছিল কবিতার জন্য, যা বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ব্যবহৃত হতো। সাহিত্যিক ভাষা কোইনে লেখা কবিতার অংশগুলো ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আরবি ভাষার প্রাচীনতম উদাহরণ।

ধ্রুপদী আরবি সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো ‘মুআল্লকাত’ নামক কবিতা সংকলন। আরব পণ্ডিতদের মতে, ইসলামি যুগের আগে তদানীন্তন প্রাক-ইসলামি কবিদের লেখা সেরা সাতটি দীর্ঘ কবিতা সংগ্রহ করে একে একত্রে সংকলন করা হয়। এই প্রাক-ইসলামি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ইমরুল-কায়েস, যিনি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। পরবর্তী যুগে আরবি ব্যাকরণবিদরা যে ভাষাকে ‘আরাবিয়্যা’ নাম দিয়ে প্রমিত আরবি হিসেবে গ্রহণ করেন, তার প্রথম নিদর্শন এই কবিতাগুলো। কুরআন পাঠে যে আরবি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ ব্যবহার হয়, সেটিও এই প্রমিত আরবির উদাহরণ।

তাই বলা যায়, ধ্রুপদী আরবি, যেটি ৬ষ্ঠ শতক থেকে প্রচলিত হয়, সেটাতেই পবিত্র কুরআন লেখা হয়েছে। কুরআন লেখার সময় ধ্রুপদী আরবি ভাষার সাতটি উপভাষা ছিল, যার সবকটিতেই কুরআন লেখা হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশ সংস্করণটি সেই মানদণ্ড হয়ে উঠেছে, যার উপর ভিত্তি করে আজকের কুরআন পঠিত হয়।

পার্থক্যগুলো উচ্চারণে; শব্দভান্ডার বা ব্যাকরণে নয়। কুরআনের আরবি প্রাক-ইসলামিক ধ্রুপদী আরবি কবিতার অনুরূপ, তবে সম্পূর্ণভাবে নয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের শুরু থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত, ইসলামি সাম্রাজ্যের বিজয় আরবি ভাষাকে নতুন নতুন দূরবর্তী দেশে ছড়িয়ে দেয়। ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পর আরবি ভাষাকে মানসম্মত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কারণ, বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ভাষা ব্যবহার শুরু করেছিল। যার কারণে একে আরও ব্যবহারিক করা হয়, নতুন শব্দভাণ্ডার তৈরি করা হয়, এবং গদ্যের ব্যাকরণ ও গদ্যশৈলী প্রমিত করা হয়।

সব সেমিটিক ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাঞ্জনবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দমূল। সাধারণত তিনটি ব্যাঞ্জনবর্ণ নিয়ে গঠিত হয় একটি মূল শব্দ, যাদের একটি মূল অর্থ থাকে। তারপর স্বরবর্ণ যোগ করে বা উপসর্গ, মধ্যসর্গ আর অন্তঃপ্রত্যয় বসিয়ে এই মূলকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে বিভিন্ন কাছাকাছি অর্থের শব্দ তৈরি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ আরবি ‘সালিম’ মূলটি দেখা যাক। এর অর্থ ‘নিরাপদ’। মূল শব্দের সাথে স্বরবর্ণ বা উপসর্গ, মধ্যসর্গ আর অন্তঃপ্রত্যয় যোগ করে আমরা পাই: সালামুন (যার অর্থ শান্তি), মুসলিমুন (যার অর্থ মুসলিম)। আবার ‘কিতাব’ দেখি, যার অর্থ ‘বই’। এ থেকে পেলাম কুতুবি (যার অর্থ বই বিক্রেতা), মক্তব (যার অর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়)। আর এভাবেই আরবি ভাষার বিভিন্ন শব্দভাণ্ডার তৈরি হয়েছে।

যখন লিখিত ভাষা হিসেবে ধ্রুপদী আরবি প্রমিত হচ্ছে, আরব সাম্রাজ্যের শহরগুলোতে আরবি ভাষার স্থানীয় উপভাষাগুলোও আবির্ভূত হয়। এই উপভাষাগুলো সরাসরি ধ্রুপদী আরবি থেকে আসেনি, বরং প্রাক-ইসলামিক আরবি উপভাষা ‘কোইন’ থেকে এসেছে। লেভান্ট এবং মেসোপটেমিয়ার উপভাষাগুলো আরামাইক দ্বারা, মাগরেবের উপভাষাগুলো বারবার (Berber) দ্বারা, মিশরের উপভাষাগুলো কপ্টিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

এই নতুন উদীয়মান উপভাষাগুলোর প্রথম শতাব্দীকে নিও বা নব্য-আরবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যদিও ধ্রুপদী আরবি প্রমিত ছিল, সবাই এটি নিখুঁতভাবে লিখতে পারত না। ক্লাসিক্যাল আরবি এবং নব্য-আরবি বা এর উপভাষা উভয়ের বৈশিষ্ট্য ধারণ করা লেখাকে মিডল বা মধ্য আরবি ভাষা বলা হয়।

‘মিডল’ কোন সময়কে বোঝায় না, বরং এই আরবি ক্লাসিক্যাল এবং নব্য-আরবির কথোপকথনের মধ্যবর্তী ভাষা ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিও আরবি উপভাষাটি (যেটি আধুনিক) আধুনিক আরবিসহ কথোপকথন উপভাষায় বিকশিত হতে থাকে, কিন্তু সাহিত্যিক আরবি তুলনামূলকভাবে স্থির ছিল, কারণ কুরআনের আরবিকে সর্বদাই আদর্শ হিসেবে দেখা হতো।

আদর্শ আরবি অনুসরণ করার জন্য এটি সম্ভবত উপভাষার উপর রক্ষণশীল প্রভাব ফেলেছিল, এবং এই কারণে নেপোলিয়ন মিশরে প্রবেশের পরেও তাদের মধ্যে খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি।

মধ্যযুগের প্রথমদিকে আরবি ভাষা ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের

দেশগুলোর সংস্কৃতির প্রধান বাহন। এটি বিশেষ করে বিজ্ঞান, গণিত এবং দর্শনে বহুল ব্যবহৃত হতো। ফলে ইউরোপের দেশগুলোর অনেক ভাষাও আরবি থেকে প্রচুর শব্দ ধার করেছে।

ইউরোপের খ্রিস্টান ও আরবের মুসলিম সভ্যতার নৈকট্য এবং দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম সংস্কৃতি ও আরবি ভাষার উপস্থিতির কারণে স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, কাতালান এবং সিসিলিয়ান শব্দভাণ্ডারে আরবি শব্দ দেখা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, ‘আলজেবরা’ বা ‘বীজগণিত’ আরবি শব্দ ‘আল-জাবর’ থেকে এসেছে। মাল্টিজ বা মাল্টার ভাষা হলো একটি সেমিটিক ভাষা, যা আরবি ভাষার একটি উপভাষা থেকে এসেছে এবং এটি ল্যাটিন বর্ণমালায় লেখা হয়। গ্রীক এবং বুলগেরিয়ানসহ বলকান রাষ্ট্রের ভাষাগুলোও অটোমান তুর্কিদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আরবি ভাষার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শব্দ অর্জন করেছে।

১৭৯৮ সালে আরব বিশ্ব প্রথমবারের মতো পশ্চিমা বিশ্বের সাথে যোগাযোগের বৃহত্তর যুগে প্রবেশ করে এবং নতুন পশ্চিমা ধারণাগুলো প্রবাহের জন্য আরবি ভাষাকে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিকায়ন করার প্রয়োজনিয়তা অনুভব করে। ফলশ্রুতিতে আরবি ভাষার আঞ্চলিক একাডেমিগুলো ভাষার একটি সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করে। সংস্কার প্রক্রিয়াটি প্রধানত ভাষার শব্দভান্ডার সম্প্রসারণ এবং ভাষাকে আধুনিক করা নিয়ে ব্যাপক কাজ করে। সংস্কার প্রক্রিয়ার পর আরবি ভাষা আধুনিক স্ট্যান্ডার্ড আরবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

বিশ্বজুড়ে আরবি ভাষা অন্যান্য অনেক ভাষাকে প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে মুসলিম সংস্কৃতি এবং মুসলিমরা যেসব দেশ জয় করেছিল সেগুলোর ভাষাকে। সর্বাধিক প্রভাবিত ভাষার মধ্যে কয়েকটি হলো ফার্সি, তুর্কি, হিন্দি, উর্দু, কাশ্মীরি, কুর্দি, বসনিয়ান, কাজাখ, বাংলা, মালয় (ইন্দোনেশিয়ান এবং মালয়েশিয়ান), মালদ্বীপ, পশতু, পাঞ্জাবি, আলবেনিয়ান, আর্মেনিয়ান, আজারবাইজানীয়, সিসিলিয়ান, স্প্যানিশ, গ্রীক, বুলগেরিয়ান, তাগালগ, সিন্ধি, ওড়িয়া, হিব্রু, হাউসা, এবং আফ্রিকার কিছু কিছু ভাষা, যেমন: সোয়াহিলি, সোমালি। বিপরীতে, অন্যান্য ভাষা থেকেও আরবি ভাষায় শব্দ এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে আরামাইক, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, ফার্সি এবং কিছুটা তুর্কি (উসমানী সাম্রাজ্যের কারণে), ইংরেজি এবং ফরাসি (লেভান্টে তাদের উপনিবেশের কারণে) এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন- আবিসিনিয়ান।

আরবি বর্ণমালা লেখা হয় ডান দিক থেকে বাম দিকে। এই বর্ণমালাগুলো নাবাতিয়ানের মাধ্যমে আরামাইক থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সাধারণ লেখার পাশাপাশি আরবি বর্ণমালার অনেকগুলো লিখনশৈলী বিকশিত হয়েছিল।

এদের মধ্যে অন্যতম ও সুন্দর একটি লিখন পদ্ধতি হলো আরবি ক্যালিগ্রাফি। পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য বই লেখার জন্য, এবং মসজিদ, মাজার বা ইসলামের স্মৃতিসৌধের শিলালিপিগুলোর সজ্জা হিসেবে আরবি ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার দেখা যায়। এই ক্যালিগ্রাফিগুলো কুরআনের একটি আয়াত বা একটি হাদিস বা আরবিতে লেখা যেকোনো বিমূর্ত আর্ট বা শৈল্পিক নকশা হতে পারে।

ক্যালিগ্রাফিগুলো বেশ মনোমুগ্ধকর হয় বলে বিভিন্ন ডিজাইন হিসেবে এগুলোর ব্যবহার চোখে পড়ে। সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে এসব ক্যালিগ্রাফির বিশ্বজোড়া ব্যাপক কদর রয়েছে।

সংকলনেঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’

আরবি ভাষার উৎস, জন্ম ও ক্রমবিকাশ- এম এ এস ইমন

আরবি নামটি শুনলে প্রথমেই আমাদের মনে আসে এটি পবিত্র কুরআনের ভাষা, যা ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। সারা বিশ্বের মুসলমানরা প্রতিদিন তাদের প্রার্থনায় আরবি ভাষায় কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে থাকেন।

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আরবি ভাষা মুসলমানদের কাছে একটি অতি পবিত্র ভাষা হিসেবে গণ্য।সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাতৃভাষা ছিল আরবি, আর আল্লাহ জিব্রাইলের (আ.) মাধ্যমে তার উপর এই ভাষায় ওহী নাযিল করতেন।

ঐতিহাসিকভাবে মুসলিমদের বিশ্বাসমতে, আরবিই সেই ভাষা যার মাধ্যমে জান্নাত বা স্বর্গে মানুষ একে অন্যের সাথে বা ফেরেশতাদের সাথে

যোগাযোগ করবে।

আরবি হলো বিশ্বের বহুল ব্যবহৃত কথ্য ভাষাগুলোর মধ্যে একটি। ব্যবহারের দিক থেকে এটি পঞ্চম স্থানে, যা আজকের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে একটি সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এমনকি এর ব্যবহার বিভিন্ন উপভাষাতেও রয়েছে। উপরেই বলা হয়েছে, আরবি ভাষা মুসলিমদেরর কাছে একটি ধর্মীয় ভাষা হিসেবেও কাজ করে।

কারণ, আরবি হলো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা, এবং এটি ইসলাম ধর্মের সাথে সরাসরি যুক্ত। এভাবে এই ভাষা ধর্মীয় তাৎপর্যের সাথে সাথে ঐশ্বরিক উদ্ঘাটনের সাথেও যুক্ত, যা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

জনপ্রিয় এই আরবি ভাষা কোথা থেকে এসেছে? এর জন্ম কীভাবে হলো? আর, কীভাবেই বা এর পরিবর্তন ঘটেছে? প্রাচীন এই ভাষা সম্পর্কে জানাতেই আজকের এই লেখা। পাঠকবৃন্দ, তো চলুন আরবি ভাষা সম্পর্কে জানতে ঘুরে আসি ইতিহাসের পাতা থেকে।

আজকের বিষয় হলো আরবি ভাষা, যাকে আরবিতে ‘আল আরাবিয়া’ বলা হয়। প্রায় ২৯৩ মিলিয়ন স্থানীয় ভাষা ব্যবহারকারী, এবং বিশ্বব্যাপী মোট ৪২২ মিলিয়ন মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলেন। বিশ্বের ২৬টি দেশের অফিসিয়াল ভাষা আরবি। এটি জাতিসংঘের ছয়টি অফিসিয়াল ভাষার মধ্যে একটি।

কুরআনের ভাষা হিসেবে এটি সারা বিশ্বের ১.৭ বিলিয়ন মুসলমানের ধর্মীয় ভাষাও। যদিও তাদের অধিকাংশই আরবি ভাষায় মনের ভাব আদান-প্রদান পারে না, কিন্তু প্রার্থনা এবং ধর্মীয় অধ্যয়নের জন্য আরবি ভাষা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান তাদের অধিকাংশেরই রয়েছে। এই ভাষার রয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্র্য।

প্রধান বৈচিত্র্যগুলোর মধ্যে একটি হলো কুরআনের শাস্ত্রীয় আরবি। অনেক পণ্ডিত একে আরবি ভাষার সবচেয়ে নিখুঁত রূপ বলে মনে করেন, এবং কেউ কেউ বলেন যে, এটি একমাত্র সত্যিকারের আরবি, কারণ এটাই ছিল সেই ভাষা যে ভাষায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ শেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে কুরআন অবতীর্ণ করেন। তারপর রয়েছে মডার্ন স্ট্যান্ডার্ড আরবি, যা আজ অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত আরবি ভাষার একটি রূপ।

এটি সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবির আধুনিক রূপ, যা কুরআনের ধ্রুপদী

আরবির উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটা ঠিক শাস্ত্রীয় আরবির মতো নয়, কিন্তু উভয়কেই আরবরা ‘আল-ফুশা’ বলে উল্লেখ করেছে, যার অর্থ ‘বাকপটু বক্তৃতা’।

সেমিটিক ভাষার উপগোষ্ঠীর সর্বোত্তম শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে ভাষাবিদদের মধ্যে এখনও ভিন্নমত দেখা যায়। সেমিটিক ভাষাগুলো প্রোটো-সেমিটিক এবং মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার উদ্ভবের মধ্যে, বিশেষত ব্যাকরণে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বলে তারা মনে করেন।

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়- আরবি ভাষা সেমিটিক ভাষা পরিবার থেকে এসেছে, এবং এটি ঐ পরিবারের অন্যান্য সেমিটিক ভাষার সাথে বিকশিত হয়েছে। সেই দিক থেকে বিশেষ করে আরবি ভাষা মূলত কোনো নির্দিষ্ট ভাষা কোথা থেকে এসেছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন, কারণ ভাষা সর্বদা পরিবর্তিত এবং বিকশিত হয়।

আরবি এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন- হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় সব একই প্রোটো-সেমিটিক ভাষা থেকে বিকশিত হয়েছে। আরবি ভাষা মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা, যেখানে সেন্ট্রাল সেমিটিকের আরেকটি শাখা থেকে হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় ভাষাগুলো এসেছে। সেমিটিয় গোত্রের ভাষাসমূহের অন্তর্গত জীবিত সেমিটিক ভাষাগুলো হলো আধুনিক হিব্রু ভাষা (ইসরায়েলের ভাষা), আমহারীয় (ইথিওপিয়ার ভাষা), এবং ইথিওপিয়ায় প্রচলিত অন্যান্য ভাষা। মৃত সেমিটিয় ভাষাগুলোর মধ্যে আছে প্রাচীন হিব্রু, আক্কাদীয় (ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয়), সিরীয় ও ইথিওপীয় ভাষা।

বহু আরব বিশেষজ্ঞ আরবি ভাষার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে আল ক্বালবি তার লিখিত কিতাব আল-আসাম বইয়ে লিখেছেন, ব্যাবিলন থেকে আসা আমালিয়ার জায়ান্টরাই প্রথম আরবিতে কথা বলতেন, এবং তাদের সাথে এটি আরব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেন।

এছাড়া একটি জনপ্রিয় ও ব্যাপক গৃহীত তত্ত্ব ও ধারণা হলো- আরবি ভাষা দক্ষিণ আরব ও আধুনিক ইয়েমেনের আশেপাশে উদ্ভূত হয়েছে, এবং পরে এটি উত্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। পাঠক, চলুন দেখে আসি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবার থেকে আরবি ভাষা কীভাবে এলো তার একটি সম্ভাব্য প্রবাহ চিত্র।

প্রাচীনকালে আরবের অধিবাসীরা বিভিন্ন সেমিটিক ভাষায় কথা বলত। দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রাচীন দক্ষিণ আরব পরিবারের (যেমন- দক্ষিণ

থামুডিক) অন্তর্গত এবং এর বাইরের বিভিন্ন সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার ব্যবহার ছিল।

বিশ্বাস করা হয়, আধুনিক দক্ষিণ আরবীয় ভাষার (নন-সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষা) পূর্বপুরুষরাও এই সময়ে দক্ষিণ আরবের ভাষায় কথা বলত। উত্তরে, উত্তর হিজাজের মরূদ্যানে, দাদানিটিক এবং তায়মানিটিক শিলালিপির ভাষাগুলোর কিছুটা প্রতিপত্তি ছিল। নজদ এবং পশ্চিম আরবের কিছু অংশে ‘থামুডিক সি’ নামে শিলালিপিতে প্রাপ্ত একটি ভাষা পণ্ডিতরা খুঁজে পেয়েছেন।

পূর্ব আরবে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে হাসাইটিক নামে পরিচিত একটি ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া, আরবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, থামুডিক বি, থামুডিক ডি, সাফাইটিক এবং হিসমাইক নামে পণ্ডিতরা চারটি বিভিন্ন ভাষা পেয়েছেন। ভাষাপণ্ডিতদের প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, সাফাইটিক এবং হিসমাইক প্রকৃতপক্ষে আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপ এবং সেগুলোকে পুরনো আরবি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

আরবি সম্পর্কিত অসংখ্য সেমিটিক ভাষা ত্রয়োদশ এবং দশম শতাব্দীর মধ্যে আরবে ব্যবহার হতো। কিন্তু এগুলোর এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা তাদের আরবি ভাষা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। ‘আরব’ হিসেবে উল্লেখ করা লোকদের প্রাচীনতম প্রমাণ খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর একটি অ্যাসিরিয়ান শিলালিপিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এতে শুধু আরবদের কথা বলা হয়েছে। এটি তাদের ভাষার কোনো প্রমাণ দেয় না।

খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টাব্দ ৪র্থ শতাব্দীর মাঝে এমন কিছু শিলালিপি পাওয়া গেছে যা আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপের প্রমাণ দেয়। এই শিলালিপিগুলোর মধ্যে কিছু আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপ এবং অন্যগুলো আরামাইক ভাষায় লেখা, তবে এতে আরবির কিছু প্রভাব দেখা যায়। এই শিলালিপিগুলোতে বেশিরভাগই সাধারণ নাম, তাই এটাও আমাদের আরবি ভাষা সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য দেয় না।

আরবি ভাষার সম্ভাব্য প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মনে করা হয় জর্ডানের বায়ির এলাকায় প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমদিকের একটি শিলালিপিকে। অবশ্য এর ভাষা আরবি না অন্য কোনো সেমিটিক ভাষা তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। তবে, প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধের দিককার বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে

[illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible]

[illegible] ([illegible] Levant)-[illegible]

[illegible]

[illegible] (Ein Avdat) [illegible]

[illegible] ‘[illegible]’-[illegible]

[illegible]
[illegible], [illegible] ‘[illegible]’